THE LITERARY SCIENTIST
A Multi-Disciplinary Journal for Literature and Science

https://theliteraryscientist.org/

Volume 1
Issue 1
04.12.2023

Paper Title:

শ্রীগদ্যশরীর: একটি বিশ্লেষণী পাঠ

Author(s):

দেবশ্রী পাল

Debasree Pal is a Researcher in Bengali at Kasi Hindu University.

The Literary Scientist(TLS) A Multi-Disciplinary Journal for Literature and Science follows an Open Access Policy for copyright and Licensing. If you are using or reproducing content from this platform, you need to appropriately cite the author(s) and the Journal name.

‘শ্রীগদ্যশরীর’: একটি বিশ্লেষণী পাঠ

_____ দেবশ্রী পাল

Abstract

ইন্দ্রিয় মানুষকে প্রকৃতির স্পর্শ অনুভব করতে শেখায়, আর প্রকৃতিও সেই স্পর্শ উপলব্ধি করতে পেরে তার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায়; একইভাবে পল্লব-এর সাহায্যে একটি বৃক্ষও তার প্রকৃতির সান্নিধ্যে যেমন আসে তেমনই প্রকৃতিও তাকে সমাদর করে। এক্ষেত্রে বৃক্ষের সব পল্লব-এর কার্যকারিতা একই প্রকারে সংঘটিত হলেও, সাহিত্যিক শুধুমাত্র ‘পঞ্চপল্লব’ শব্দ ব্যবহার করে মানব দেহের ‘পঞ্চ ইন্দ্রিয়’-এর ব্যঞ্জনাকে যেন আরও বেশি করে ভাবিয়েছেন। কারণ গদ্যশরীরের পঞ্চপল্লব অর্থাৎ গদ্যশরীরের পঞ্চইন্দ্রিয়, এর মাধ্যমে গদ্যকার যেন গদ্যগুলোর সঙ্গে পাঠক মনের একটা যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেছেন। তাই এই ‘পঞ্চপল্লব’-এর মধ্যে থাকা কুড়িটি গদ্যের সঙ্গে আমার পাঠকহৃদয় কীভাবে একাত্ম হয়েছে, সেই গদ্যের স্বরূপ কেমন, আজকের সময়ে আমাদের কাছে তার প্রাসঙ্গিকতা কতখানি-জিজ্ঞাসু মন নিয়ে এহেন বিবিধ প্রশ্নের উত্তর খোঁজার প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে ‘শ্রীগদ্যশরীর’-এর একটি বিশ্লেষণী পাঠ তৈরি করে ফেললাম, যার সম্পূর্ণ আলোচনা নিচে করা হল।

পর্তুগালের লিসবন থেকে প্রকাশিত ‘কৃপাশাস্ত্রের অর্থভেদ ’বাংলা ভাষায় প্রথম প্রামাণিক গদ্য হলেও বাংলায় সাহিত্যিক গদ্যের সূচনা হয় এর ঠিক একশ বছর পর ‘তত্ত্ববোধিনী’ পত্রিকার মধ্যে দিয়ে। তবে সাহিত্যের ইতিহাসের কাছে গেলে দেখতে পাবো, প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে গদ্যের ব্যবহার ছিল না। সেই সময় ধর্মকেন্দ্রিক পদ্যের আশ্রয় ছিল মানব জীবনের আবেগ ও অনুভূতির কাছে। পরবর্তীকালে জ্ঞান ও চিন্তারবাহন রূপে সার্থক গদ্যের আবির্ভাব হয়। কালের প্রবাহে গদ্যরীতির বিশুদ্ধতর মূর্তি দেখা যায় প্রবন্ধের যুক্তিধর্মী আলোচনায়। কিন্তু গদ্যরীতিকে সমৃদ্ধ করেছে নাটক-উপন্যাস-গল্প-এর মতন প্রকরণগুলি। দেড়শ বছরের অধিক সময়কাল অতিক্রান্ত হলেও সাহিত্যের বিশুদ্ধতর রূপে প্রবন্ধ আজও কতটা যুক্তিগ্রাহ্য, তাঁর প্রমাণস্বরূপ সন্মাত্রানন্দের গদ্যসংকলন ‘শ্রীগদ্যশোরীর’কে কেন্দ্র করে আমাদের এই আলোচনা।

গদ্য ও পদ্যের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা যায় না কারণ এই দু’য়েরই কাজ সূক্ষ্ম মানসিক প্রক্রিয়া প্রকাশের মাধ্যম রূপে। এই প্রসঙ্গে বলতে পারি, ‘উৎকৃষ্ট গদ্যভাষা আমাদের চিন্তা ও ভাবনা প্রকাশের সাহিত্যবাহন, আর পদ্যভাষা অনুভূতি ও হৃদয়াবেগের প্রকাশবাহন।... গদ্যভাষা চিন্তা ও মনন ক্রিয়ার ভাষারূপ, আর পদ্যভাষা হৃদয়াবেগ ও আনন্দবেদনা-অনুভূতির ভাষারূপ। গদ্যভাষা আধুনিকতার প্রধানবাহন। বিশ্লেষণ, বিচার, সংশয় ও জিজ্ঞাসা আধুনিক চিন্তা পদ্ধতির প্রধান লক্ষণ। আবেগহীন, নির্মোহ বিজ্ঞানদৃষ্টি আধুনিক জীবনের ভিত্তিভূমি। গদ্যভাষাই এই দৃষ্টি ও জিজ্ঞাসার বাহন। দ্ব্যর্থহীনতা, নৈর্ব্যক্তিকতা,যাথার্থ্য ও পরিমিতির গদ্যের মূল উপাদান’।[১] আধুনিকতার বাহন হয়ে গদ্য ভাষার যে লক্ষণগুলি প্রসঙ্গ সূত্রে উক্ত অংশটুকুর মধ্যে উল্লেখিত হয়েছে, তার সবকটি আমরা সম্প্রতি সাহিত্যিক সন্মাত্রানন্দের প্রকাশিত গদ্যসংকলন ‘শ্রীগদ্যশরীর’-এ পেয়েছি।

'মনুনদীর স্রোতোধারা ভালোবেসে...'উৎসর্গীকৃত এই গদ্যসংকলন সেঁজুতি বন্দোপাধ্যায়ের প্রচ্ছদে সেজে উঠেছে এবং প্রকাশিত হয়েছে ধানসিড়ি থেকে জুন, ২০২৩-এ। গ্রন্থটি সম্পর্কে লেখক 'ভূমিকা' অংশে লিখেছেন, 'শ্রীগদ্যশরীর গ্রন্থটি পঞ্চপল্লবে উপন্যস্ত। প্রতিটি পল্লবে চারটি করে প্রবন্ধ নিয়ে মোট কুড়িটি প্রবন্ধ এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, লোককথা ও মহাজীবন-এই প্রবন্ধ সমূহের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এরা প্রকাশিত হয়েছিল। এদের উদ্দেশ্য পাঠকের মনে চিন্তা, চর্চা, মনন, বিশ্লেষণ ও অনুধ্যানের উদ্দীপনা সঞ্চারিত করা। সেই কাজ যদি স্বল্প পরিমাণে ও এ বই করে উঠতে পারে, তাহলেই শ্রম সার্থক জ্ঞান করব'।[২] এখানে বিশেষ দ্রষ্টব্য, গদ্যকার গদ্যগুলির উপর মানবসত্তা আরোপ করায় তাঁর 'নিজের উদ্দেশ্য'-এর পরিবর্তে 'এদের উদ্দেশ্য' অর্থাৎ গদ্যসংকলনের অন্তর্গত কুড়িটি প্রবন্ধের উদ্দেশ্যকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। আর সেই উদ্দেশ্যকে স্মরণে রেখেই শব্দশিল্পীর হাতে 'পঞ্চপল্লব'এর ন্যায় পঞ্চ ইন্দ্রিয় নির্মাণ সেই মানবসত্তাকে আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। অতএব সেই ইন্দ্রিয় পঞ্চমকে নিয়ে গড়ে উঠেছে একটি শরীর, গদ্যশরীর। শুধু শরীর থাকলে তো হয় না, তার মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হয় অর্থাৎ শরীর তখনই কর্মক্ষম হয়ে ওঠে যখন তাতে 'আত্মা'র উপস্থিতি থাকে। এই আত্মাই হল 'ব্রহ্ম'। সে সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ স্পষ্ট করে বলেছেন,'তোমরা যাকে ব্রহ্ম বল, আমি তাকেই মা বলে কই'।[৩] আর 'মা'-ই হল সেই শক্তি, সেই সৌন্দর্য, সেই ঐশ্বর্য সম্পন্ন এক অপারসত্তা যা 'শ্রী' নামের ব্যঞ্জনায় সাহিত্যিক তাঁর গদ্যশরীর-এর মধ্যে স্থাপন করে গদ্যসংকলনটির যথার্থ প্রাণ প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং তা একটি মানবসত্তার স্বরূপ 'শ্রীগদ্যশরীর'-এর পূর্ণতা লাভ করেছে। অতএব এহেন নামকরণের তাৎপর্য অন্বেষণ আমার মত গবেষকের গবেষণাসত্তাকে নিঃসন্দেহে আরও

বেশি করে জাগিয়ে তুলবে। এভাবেই শব্দসাধক সন্মাত্রানন্দের ‘শ্রীগদ্যশরীর’, কালিদাসের ‘মেঘদূত’-র ন্যায় আমার চিন্তা তথা মননের জগতে বৈচিত্র্যময় বার্তার প্রেরক হয়ে পাঠকসত্তাকে নানাভাবে উর্বর করে তুলেছে।

গ্রন্থটির বাহ্যিক বিষয়গুলির অন্বেষণ তথা বিশ্লেষণ করে যখন অভ্যন্তরীণ বিষয়ের ওপর দৃষ্টিপাত করি তখন ‘সূচিপত্র’টিকে আমার ভীষণ রকম পরিচিত মনে হয়। কারণ প্রায় একই প্রবন্ধের সম্ভার নিয়ে বিগত দশকের মাঝামাঝি সময়ে সন্মাত্রানন্দের লেখা মোট বারোটি গদ্যসংকলিত ‘আরক্তসুন্দর মুখশ্রী’ ত্রিপুরার স্রোত প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। এটি ছিল তাঁর প্রথম গদ্যগ্রন্থ। বইটির প্রচ্ছদপট এঁকেছেন আশোক দেব। উক্ত বারোটি গদ্যের মধ্যে থেকে আটটি গদ্য নতুন গদ্যসংকলনে জায়গা করে নিয়েছে। ‘আরক্তসুন্দর মুখশ্রী’ তথা ‘শ্রীগদ্যশরীর’ বইয়ের অন্তর্গত আটটি গদ্য, গ্রন্থাকারে সংকলিত হওয়ার পূর্বে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়া বাকি বারোটি গদ্যের মধ্যে সাতটি গদ্যের পত্রপত্রিকায় প্রকাশ সম্পর্কে অবগত থাকলেও বাকি পাঁচটি গদ্যের পত্রপত্রিকায় প্রকাশ সম্পর্কে আমি অবগত নই, আশাকরি, ভবিষ্যতে আমার অন্বেষণময় সত্তা সেই সম্পর্কেও আমাকে অবগত করাবে। তবে গদ্যগুলি সম্পর্কে মূল আলোচনায় প্রবেশ করার আগে ‘বইপাঠ’ সংক্রান্ত আমার মনে হওয়া একটি বিষয়কে এখানে উল্লেখ করতে চাই। সেটি হল, বইয়ের গদ্যগুলিকে সূচীপত্রের ক্রমানুসারে পাঠ করার পর বিপরীত ক্রমে পুনরায় পাঠ করার ফলে তা আমার কাছে অনেক বেশি যুক্তিগ্রাহ্য ও মনন সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। কারণ ‘বিবেকবাণীর ভাষ্যকার স্বামী রঙ্গনাথানন্দ’ গদ্যটিতে গদ্যকার লিখছেন, ‘আমি লেখালিখি করি জেনে আমাকে খুব উৎসাহ দিয়েছিলেন। আমার লাইন অব ওয়ার্ক কী হবে, তাও বলেছিলেন। আরও কিছু কথা... সেসব থাক’।[৪] অর্থাৎ গুরুর বাতলে দেওয়া পথে হেঁটে সন্মাত্রানন্দ কীভাবে দশ বছরের সাধনায় রপ্ত করেছিলেন তাঁর

নির্মাণ কৌশলকে এবং সাহিত্যে তা প্রয়োগ করে 'নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা'র মত ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস সৃজন করে বাংলা সাহিত্যের পালাবদল ঘটিয়েছেন; সেই দীর্ঘ পথ চলার কথা আমরা জানতে পারি, আলোচ্য বইয়ের প্রথম গদ্য "'নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা'-র ভিতরবাড়ি" মধ্যে। অতএব সাহিত্য সাধনার যে বীজ তাঁর মনে প্রথম থেকেই সুপ্ত অবস্থায় ছিল তা গুরু সান্নিধ্যে সিক্ত হয়ে ক্রমশ ঊর্বর হতে হতে ফলদায়ী বৃক্ষে পরিণত হয়েছে,যা একটি শরীরের অবয়বে 'শ্রীগদ্যশরীর'-এ যেভাবে ধরা পড়েছে সেটি এইরূপেঃ

প্রথমপল্লব-

প্রারম্ভিক গদ্যটি হল "'নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা'-র ভিতরবাড়ি"। পূর্বে এটি রাহুল দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'চিন্তা' পত্রিকার প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, শারদীয়া ২০১৯-এ প্রকাশিত হয়েছিল। এর পূর্বে এই গদ্যের বেশ খানিকটা অংশ 'ধরা যাক, আজকের বাংলাদেশের মুনসিগঞ্জের অন্তর্গত বজ্রযোগিনী গ্রামের এক নগন্য কৃষক চাষের

জমিতে মাটি চষতে চষতে পেয়ে গেলেন একটা কাঠের বাক্স...তিনি জীবনের এক অনন্য অর্থ – যে অর্থে প্রত্যেকেই আমরা অতীশ, প্রত্যেকেই দীপংকর'।[৫] পর্যন্ত 'বঙ্গদর্শন' ই-পত্রিকায় "'নাস্তিকপণ্ডিত' অতীশ দীপংকর- এক রহস্যমদির জীবনের কথাবস্তু" নামে ১৯ নভেম্বর, ২০১৭ প্রকাশিত হয়েছিল। দীপংকর শ্রীজ্ঞান সম্পর্কিত দীর্ঘ কৌতুহলকে নিবারণ করতে গিয়ে কীভাবে পুরাণপ্রখ্যাত মনুনদীর স্রোত ধারায়

নিজের মানস প্রতিমার সঙ্গে একাত্ম হলেন, এখানে গদ্যকার সেই প্রসঙ্গে বলেছেন, 'দেখলাম, এই নদীই ধরিত্রীর চিরন্তনী, আহত নারী হৃদয়। যা যুগ যুগ ধরে শুশ্রূষা চেয়ে নদীজলের মতো অনন্তের দিকে বয়ে চলে গেছে। এই নদীই আমাকে অতীশ সম্পর্কে আরও জানতে বলল। গ্রন্থ থেকে তো বটেই, ততোধিক অনুভব থেকে'।[৬] আসলে

এই নদী, নারীর কল্পরূপ ধারণ করে কত সন্ধ্যাকালীন নিস্তব্ধতায়, কত রাত্রিকালীন নির্জনতায়, লেখকের অভিভাবক হয়ে কখনও মুখোমুখি বসে থাকত, কখনও পড়া নিত, কখনও কথা বলত আবার কখনও প্রশ্ন করতে করতে অতীশ জীবনের অজানা ফাঁকগুলিকে পূর্ণ করার তৎপরতা তাঁর চিন্তা স্রোতে মিশিয়ে দিত। দ্বিতীয় গদ্য, 'ত্রিপুরেশ্বরী ও ত্রিপুরার সুপ্রাচীন ঐতিহ্য'। যেখানে খ্রিস্টিয় ষোড়শ শতকে ত্রিপুরার ঐতিহ্যময় প্রাচীন ইতিহাসকে কেন্দ্র করে মা ত্রিপুরেশ্বরীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। গদ্যটি 'আরক্তসুন্দর মুখশ্রী'তে 'ত্রিপুরার

ত্রিপুরেশ্বরী 'নামে অন্তর্ভুক্ত হলেও এর আগে গদ্যটি 'সাপ্তাহিক বর্তমান' পত্রিকায় ৪ঠা জুন, ২০১১তে প্রথম প্রকাশিত হয়। বিশ্বসংসারে যা ঘটে গেছে, যা ঘটে চলেছে, আর যা ঘটবে তার সমস্তটাই তোমাকে জানতে হবে, শিখতে হবে, বুঝতে হবে, না হলে প্রতিযোগিতার ঘোড়দৌড়ে পিছিয়ে যাবে; এইরূপে যখন বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় 'অসীমতথ্য'কে মনে রাখার প্রক্রিয়াকরণ চলছে **তখন** 'অসীমসত্য'কে আমরা ভুলতে বসেছি। কী এই 'অসীমসত্য'? 'উপনিষদ' বলেছে, 'তত্ত্বমসি' আবার কখনও বলেছে 'অহম্ ব্রহ্মাস্মি' অর্থাৎ 'আমিই সেই' বা 'আমিই ব্রহ্ম'; যেটি অসীমসত্য। অতএব আমরা নিজেকে ভুলতে চাই; সেই আমি বা আত্মা বা ব্রহ্ম সাধারণত পৃথক হলেও তা কিন্তু একই দেহে বিদ্যমান, যার বিস্তার সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে। আমাদের মনের মধ্যে সে আছে অতলে তলিয়ে। অসীম এই সত্তাই হল 'অসীম সত্য'; যাকে জানার প্রক্রিয়া বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় অনুপস্থিত থাকার

জন্য আমরা নিজেকে না-জেনে ক্রমশ নিজের থেকে দূরে সরে যাচ্ছি, নিজেকে জানার বা নিজেকে ভালো রাখার দায়িত্ব তাই অন্যের ওপর সঁপে দিয়ে প্রতিনিয়ত আত্ম অবসাদে ভুগছি, যার চরম পরিণতি আত্মহত্যা। বাস্তবিক এই সমস্যার সমাধান সূত্র, গদ্যকার 'ছান্দোগ্য উপনিষদ'-এ 'জাবাল-সত্যকাম আখ্যান' বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে নিরূপণ করেছেন। যেখানে পুথিগত বিদ্যা দিয়ে নয়, আত্মশ্রদ্ধা ও আত্মজ্ঞান অর্জনের মধ্যে দিয়ে 'অসীম সত্য'-এ

উর্ত্তীণ হওয়ার দিক নির্দেশক রূপে গদ্যটি আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। গদ্যসংকলনটিতে গদ্য প্রকরণের মাধ্যমে তিনি পদ্য প্রকরণের গভীর অনুভূতিকে আমাদের চিন্তা ও মননের প্রবাহে ভাসিয়ে দিয়েছেন, যা প্রকাশ পেয়েছে 'চর্যাপদে কৃষিজীবনের চিহ্ন'-তে। মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে গদ্যকার বলেছেন, '...চর্যার নিহিতার্থ বুঝবার মতো অধিকার আমাদের নাথাকলেও, চর্যার বহিরাঙ্গিক অর্থ থেকে সহজেই হাজার বছর আগের সমাজ জীবন নিরূপিত হতে পারে। যে-সমাজের ছবি আমরা চর্যাগীতিতে দেখতে পাই, তাতে বারবার এক শ্রম নিষ্ঠ মৃত্তিকা নিবিড় কৃষিজীবনের ছায়া এসে পড়েছে'।[৭] এর মধ্যে দিয়ে তৎকালীন পদকর্তারা আপাত অভিধা মূলক বর্ণনার মার্গ অতিক্রম করে তাঁদের সাধকসত্তার গভীর অনুভবকে সন্ধ্যাভাষার আড়ালে গোপন করে রেখেছেন; এখানেই প্রাচীন সাহিত্যের 'আদি নিদর্শন'-এর সার্থকতা যা গদ্যকারের লেখনী কৌশলে সহজ হয়ে উঠেছে। এটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'আরক্তসুন্দর মুখশ্রী'তে।

দ্বিতীয়পল্লব-

১৭৫ তম শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ত্রিপুরার বিবেকনগর রামকৃষ্ণ মিশনের মুখপত্র 'উত্তরণ'-এ সন্মাত্রানন্দের 'একটি গল্পে ভারতের জাতীয় ইতিহাস' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হলেও পরবর্তীকালে 'আরক্তসুন্দর মুখশ্রী' গদ্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। বর্তমান গদ্যসংকলনে আলোচ্য গদ্যটি সামান্য নাম পরিবর্তন করে 'একটি গল্প ও ভারতের জাতীয় ইতিহাস' হয়েছে। যার উদ্দেশ্য, লোকপ্রচলিত জনপ্রিয় গল্প শোনানো নয়, বরং জড়-জাগতিক শক্তির উত্থান ঘটানো। যে সমুত্থানকে দেখানো হয়েছে সাপ-ব্রহ্মচারীর আখ্যানে; যার কারণ ধরা পড়েছে সাহিত্যিকের লেখাতে- 'মানুষ যখন নিজেকে ঘৃণা করতে শুরু করে তখনই তার পতনের ষোলো আনা পূর্ণ হয়। মহামানব মানুষের এই পরাভব মেনে নিতে পারেন না, তিনি তাঁর স্বভূমি থেকে নেমে এসে অসহায় মানুষের দুটি হাত স্বপ্রেমে ধরেন।

তাকে জাগিয়ে তোলেন আত্ম-জাগরণের মন্ত্রে'।[৮] মহামানবের আত্ম-জাগরণ মন্ত্রকে সঙ্গে নিয়ে এবার আসা যাক 'একটি কমলালেবু'র জীবনচক্রে, যাকে কেন্দ্র করে এই পল্লবের দ্বিতীয় গদ্য "'কমলালেবু': বাসনা, সংশয় এবং আত্মপ্রেম" রচিত হয়েছে। প্রসঙ্গ সূত্রে বঙ্কিমচন্দ্র, তাঁর 'মনুষ্যফল' প্রবন্ধে মানুষকে সংসার বৃক্ষের ফল বলে থাকলেও জীবনানন্দ, তাঁর পূর্বজ-র এই সীমাবদ্ধ ভাবনাকে অতিক্রম করে কমলালেবুকে শুধুমাত্র ফল রূপে না দেখিয়ে সেটিকে চিন্ময় অবয়বে আমাদের সামনে জীবন্ত করে তুলেছেন যেটি সন্মাত্রানন্দের গদ্যময় চিত্রকল্পে সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে এইভাবে, '...সেই মুমূর্ষু ব্যক্তি, আর বিছানার কিনারে মাথার কাছে পড়ে আছে যে-কমলালেবু – তারা আলাদা নয়। যদিও তাদের আলাদা মনে হচ্ছে, যেহেতু খাদ্য-খাদক সম্বন্ধে তারা যুক্ত, তথাপি কমলালেবু ও রোগীর এই পৃথকত্ব একটি আপাত প্রতীয়মান সম্পর্ক মাত্র। আসলে তারা এক ও অবিভাজ্য'।[৯] এটা এমন এক দৃশ্য যা চিরকাল আমরা দেখে আসছি, অথচ এখানে তার মধ্যে দিয়ে জীবন দর্শনের গভীর অভিজ্ঞতা প্রতীত হয়েছে। কারণ তা সার্থক মানব-মানবীর দ্বৈত-প্রেমকে, একক-আত্মপ্রেমের কবিতায় উত্তীর্ণ করেছে। পরবর্তী গদ্যটি 'গদ্যের গলগথা' নামে ত্রিপুরার 'অরণ্য' পত্রিকায় মে, ২০১৪ তে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল।

একই বছর কলকাতার 'না'-পত্রিকায় সেপ্টেম্বর, ২০১৪ তে প্রকাশিত হলেও 'আরক্তসুন্দর মুখশ্রী' গদ্যগ্রন্থে ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তে প্রকাশিত হয়। পাঠক মনে 'গলগথা'টির শব্দ প্রয়োগ কৌতুক উৎপন্ন করলেও গদ্যকার সেই কৌতুক গদ্যারম্ভেই নিরসন করেছেন। তবে সমগ্র প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে গদ্যের 'গলগথা' ঠিক কোন কোন ক্ষেত্রে আজও প্রয়োগ করা হচ্ছে সেই সম্পর্কে গদ্যকার তাঁর একটি ভাবনা সুলভ বক্তব্যকে আমাদের সামনে উপস্থাপনা করেছেন,'কিন্তু আজ এতদিন পর এক বিশেষ শ্রেণির গদ্য – 'কবির গদ্য' – নিয়ে যাচ্ছে গভীর খাদের দিকে বাংলা গদ্যসাহিত্যকে'।[১০] 'মণিচিত্রথারু', ১৯৯৩-এর মালয়ালম ভাষার জনপ্রিয় চলচ্চিত্র, যার গল্পটি মনস্তাত্ত্বিক ও

ভীতিপ্রদ। পরবর্তীকালে ২০০৪-এ কন্নড় ভাষায় 'আপ্তমিত্র' এবং ২০০৫-এ তেলগুতে 'চন্দ্রমুখী' নামে জনপ্রিয় হয়েছিল। যদিও বাংলাতে 'রাজমহল' এবং হিন্দীতে 'ভুলভুলাইয়া' নামে প্রচার পায় ২০০৭-এ অর্থাৎ প্রায় চোদ্দবছর ধরে কীভাবে একটি সিনেমার শক্তিশালী কাহিনি সিনেমা জগতকে শাসন করছিল, সেই সম্পর্কে সন্মাত্রানন্দের একটি মনন সমৃদ্ধ আলোচনা 'মণিচিত্রথারু' নামে 'সৃজনী' ই-পত্রিকার 'সাহিত্যের বারান্দা' বিভাগে ৯মে, ২০১৭ তে প্রকাশিত হয়েছিল। ঠিক একই রকমভাবে বাংলা সাহিত্যের জগতে বাণী বসু-র 'মৈত্রেয় জাতক' উপন্যাসটি ১৯৯৬-এর জুলাই মাসে প্রথম প্রকাশিত হওয়ার পর আজও একই রকমভাবে পাঠক মহলে জনপ্রিয়তা অর্জন করে আছে। এর কারণ সম্পর্কে সাহিত্যিক সন্মাত্রানন্দ যে যে বিষয়গুলি আলোচনা এবং সমালোচনার ধারাবাহিক প্রবাহে উপস্থাপন করেছেন সেকথা 'মৈত্রেয় জাতক: পুনর্মননজাত অনুভব'-এ উল্লিখিত হয়েছে।

তৃতীয় পল্লব-

'কবির গদ্য'-এ বাংলা সাহিত্যের তরী যেখানে ডুবতে বসেছে সেখানে 'অণুগল্প'-এর পাশাপাশি 'অণুকবিতা', গদ্যকারের ভাষায় যা 'মিতায়তন কবিতা'-এর কাব্যিকমূল্য সম্পর্কে 'মিতায়তন কবিতার ঐশ্বর্য' গদ্যে তিনি বলেছেন, 'আমি অবশ্য মিতায়তন কবিতা বলতে এখানে অণুকবিতাকেই বোঝাচ্ছি না। আট-দশ লাইনে যেসব কবিতারা পূর্ণতা পেয়ে যায়, সরল বাগভঙ্গিমায় কিংবা ঈষৎ অলঙ্কৃত কারুকাজের ভিতর এক সুগভীর অনুভূতিকে তুলে ধরে সহসা চমৎকৃতি বা আচ্ছন্ন মধুর মেদুরতায় যা পাঠকের মনকে উজ্জ্বল বা মজ্জিত করে...'।[১১] যার উৎস সম্পর্কে অনেক ভ্রান্ত মত প্রচলিত থাকলেও সন্মাত্রানন্দ জানাচ্ছেন, 'মুখ্যত রবীন্দ্রনাথ তাঁর জাপান- ভ্রমণের অবসরে হাতপাখায়, রুমালে বা কাগজে দস্তখৎ দিতে গিয়ে ছোটো ছোটো কবিতা লিখেছিলেন, 'স্ফুলিঙ্গ' বা 'কণিকা'য় যা সংকলিত হয়, সেই ঘটনার থেকেই এমন অলীক ধারণার জন্ম হয়ে গিয়েছে'।[১২] এহেন ঐশ্বর্যময়

কবিতার ধারা সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য সন্মাত্রানন্দের এই গদ্যটির কাছে অবশ্যই যেতে হবে। গদ্যটি মলয় দত্ত-এর আঁকা ছবি সহযোগে 'সৃজনী' ওয়েব পত্রিকায় ১৩ জানুয়ারি, ২০১৭-তে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। অন্যদিকে 'ভাষাচরিত্র ও তার সংগ্রাম' গদ্যটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'আঙ্গিক' পত্রিকার 'সাংস্কৃতিক ক্ষয় এবং ফ্যাসিবাদ বীরোধী সংখ্যায়, অষ্টম বর্ষ, পৌষ ১৪২৬বঙ্গাব্দে। যেখানে জীবিত ভাষার লক্ষণের কথা বলতে বলতে সাহিত্যিক কালের স্রোতে বয়ে চলা বাংলাভাষার সঙ্কটের প্রসঙ্গও উত্থাপন করেছেন। এবং সেই প্রবাহকে রুধিবার জন্য তাঁর নিজস্ব মতামতকে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। "শব্দের সীমানা আর নৈঃশব্দ্যের ঐশ্বর্য-রবীন্দ্রনাথের 'সুভা'", এই তৃতীয় গদ্যটি রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে 'আবহমান' বাংলা ওয়েবপত্রে ৯ মে ২০২১-এ প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। গদ্যটি সম্পর্কে আলাদাভাবে কিছু বলার চাইতে লেখক-পাঠক সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে যে ভাবনার বৃত্ত নির্মিত হয়েছে তার যুক্তি সাপেক্ষে গদ্যের কিছু অংশ উদ্ধৃত করলাম, 'এ গল্পে একটা খুব বড়ো ভাবনা বোবা মেয়েটির অবোলা দুই চোখের পাতার মতন মেলে রাখা আছে। ভাবনাটি কিছুটা রেখে গেছেন রবীন্দ্রনাথ, কিছুটা আমি পাঠক হিসেবে সম্পূর্ণ করেছি। একটি লেখা বস্তুত লেখক ও পাঠক দুজন মিলেই তো রচনা করেন! ফলত, প্রতিটি লেখারই পাঠকভেদে তৈরি হয় একেকটি ব্যক্তিগত পাঠ'।[১৩] 'স্বামী বিবেকানন্দ, একটি নাট্যানুষ্ঠান ও এক অলোকসামান্য অভিনেত্রী' গদ্যটি প্রথম 'উদ্বোধন' পত্রিকায় মাঘ ১৪১৭ (জানুয়ারি ২০১১) তে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। আবার এটি 'আরক্তসুন্দর মুখশ্রী'-র অন্তর্গত হলেও পুনরায় 'শ্রীগদ্যশরীর'-এ স্থান পায়। গদ্যটির মূল বক্তব্য বাস্তবতাবোধ ও আবেগের পারস্পরিক মেলবন্ধনের মধ্যে দিয়ে ফরাসি নাটক 'ইৎশীল' কীভাবে নাট্যানুষ্ঠানের ইতিহাসে একবিরলতম প্রাপ্তির সৌভাগ্য বহন করে এনেছিল; আলোচ্য গদ্য থেকে সেই অংশটি উদ্ধৃত করা হল, 'একটি নাটক যে প্রধান চরিত্রকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়, তারই সদৃশ কোনো চরিত্র

যদি বসে থাকেন দর্শকাসনে, তবেই সেই প্রায় অসম্ভব ঘটনাটি ঘটে থাকে'।[১৪] যার প্রভাবে নাটকের নায়িকা সারা 'লা দিভিনি সারা' বা 'দৈবী সারা'তে উত্তীর্ণ হয়েছিল।

চতুর্থপল্লব-

প্রথম গদ্য 'জীবনানন্দের ছায়াশরীরিণী নায়িকা ও কবিতার অনুভবী পাঠক','জলসিড়ি' পত্রিকা গৌহাটি থেকে অক্টোবর, ২০১২ তে প্রকাশিত হলেও পরবর্তীতেসেটি পুনরায় 'আরক্তসুন্দর মুখশ্রী' তে স্থান পায় এবং সম্প্রতি এটি 'শ্রীগদ্যশরীর'-এর গদ্য রূপে আলোচিত হচ্ছে। যেখানে জীবনানন্দের কবিতারমধ্যে দিয়ে মৃত্যু অতিক্রান্ত মানুষের অস্তিত্ব অনুভবের কথা গদ্যকার সুষমামণ্ডিত ভাষায় উপস্থাপন করতে গিয়ে বলেছেন, "মরে গিয়েছিল সেই বনলতা? কবির অপ্রকাশিত একটি কবিতায় কোনো এক শবদাহের স্মৃতি এবং মৃত সেই নারীকে আবার খুঁজে পাওয়ার কথা পাচ্ছি।... নিজের হাতে পোড়াতে হয়েছিল 'সেই আলোকলতারে'? সামাজিক দৃষ্টিতে সে ছিল অন্য কারও ঘরনি? মরণের মধ্য দিয়ে সেই একতমা নারী দূরে চলে গিয়ে কাছে ফিরে এসেছিল কবির? সমস্ত জীবন সেই ছায়ানারীতে সংসক্ত থেকে গভীর আন্তরিকতায় মৃত্যুপারের সেই ছায়াশরীরিণীকে ভালোবেসে চলাই জীবনানন্দের জীবন?..."[১৫] কবিতার জগতে যেমন জীবনানন্দ তেমনি কথাসাহিত্যে বিভূতিভূষণের দ্বারা সন্মাত্রানন্দ অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তারই প্রভাব যেমন পূর্বোক্ত গদ্যটিতে তেমনই এর পরবর্তী গদ্যে আছে, যেখানে তিনি "বিভূতিভূষণের ইতিহাসাশ্রয়ী আখ্যান ও 'মোমেন্ট'-এর তত্ত্ব' নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই গদ্যটির মূলরূপ প্রকাশিত হয়েছিল 'ওপারের বনরেখা ঐতিহাসিক গল্প' গ্রন্থের 'প্রাককথন' অংশে। মূল লেখাটির সঙ্গে গদ্যের কিছু কিছু জায়গায় প্রয়োজনানুসারে পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। তবে গদ্যটির উদ্দেশ্য হল,গল্প-লেখার গল্প-এর মধ্যে দিয়ে গল্প-কথকের মানসিক প্রক্রিয়াকে বোঝার চেষ্টা করা। সেই প্রক্রিয়ার কেন্দ্রে থাকে 'ভ্রামক'। বিভূতিভূষণ

বারবার সেটিকে 'মোমেন্ট' বলেছেন যা ব্যক্তিকে বিশেষ ভাবনায় ভাবতে বাধিত করে। তাঁরই ইতিহাসাশ্রয়ী আখ্যানে 'মোমেন্ট তত্ত্ব'-এর প্রয়োগমূলক ব্যাখা প্রদানে আলোচ্য গদ্যটি তাৎপর্যমণ্ডিত হয়েছে। পরবর্তী গদ্য 'সারদা দেবী: এই বেদনাক্লিষ্ট পৃথিবীতে দুঃখজয়ের এক আশ্চর্য অভিজ্ঞান', এটি শ্রী মায়ের জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষ্যে আগরতলা থেকে 'স্যন্দন' পত্রিকায় ৩ জানুয়ারি, ২০০৫ প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। মাতৃস্নেহের কোমলতা ও সন্তান শাসনের দৃঢ়তার আপাত দুই বিরোধী ভাবের যুগপৎ সম্মিলন শ্রীমা সারদা। তিনি একদিকে দুঃখের অস্তিত্বকে স্বীকার করে, জাগতিক দুঃখের আধ্যাত্মিক তাৎপর্যের কথা যেমন বলেন তেমনই অন্যদিকে হাসিমুখে বলেন,'আর কেউ না থাক, জানবে তোমাদের একজন মা আছেন'।[১৬] "'শেষে সব আকাশে মিলায়': একটি অনুধ্যান" গদ্যটি এই পল্লব-এর শেষ গদ্য, এর পূর্বে গদ্যটি 'inscript.me' ওয়েব পত্রিকায় ১২ জানু, ২০২২-এ প্রকাশিত হয়। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনার ষষ্ঠ খণ্ডের অন্তর্গত 'সাগর বক্ষে' কবিতাটির মহৎ সাহিত্যিক তাৎপর্যকে বুঝতে না পেরে, মিতায়তন এই কবিতাটিকে প্রায়শই আলোচনার বিন্দু থেকে সরিয়ে রাখা হয়েছে। ঠিক কী কী কারণে এই প্রকার ভাবগত-ভাষাগত কাব্যশৈলী সাহিত্যের দরবারে কদর পায়নি, সেই সম্পর্কে আমাদের ওয়াকিবহাল করলেও এর পাশাপাশি কবিতাটির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে গদ্যকার তার গভীর ভাবদর্শনকে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন- এখানেই গদ্যটির সার্থকতা।

পঞ্চমপল্লব-

'ইচ্ছেমানুষ সান্তা' গদ্যটিতে ইচ্ছের উৎস, ইচ্ছের বৈচিত্র্যময়তা, ইচ্ছেপূরণ – এই যাবতীয় বিষয়কে ভাবনাগত করে, আমাদের মনের কল্পনা থেকে যা বাস্তব জীবনের অবয়বে প্রতিফলিত করেছে, সেই 'সকলের সান্তা'-র কথা এখানে বলা হয়েছে। যাকে কেন্দ্র করে লেখকের লেখাতে এক গভীর দর্শন লক্ষ্য করি- 'মানুষের প্রকৃত সত্তা

অসীম বা অনন্ত বলেই, তার অভাব কখনও সীমিত জিনিসে মেটে না। সে চাইতেই থাকে, চাইতেই থাকে, যতক্ষণ সে বুঝতে না পারে যে, সে আসলে নিজেকেই চাইছে। সে নিজে আসলে সম্রাট, কিন্তু নিজের সেই পরিচয় সে ভুলে গেছে। ভুলে গিয়ে ভিখিরির মতো কল্পনা করছে, বাইরে থেকে কেউ না কেউ এসে তার চাওয়াগুলো একলহমায় পূর্ণ করে দেবে। তার ইচ্ছেগুলো কেউ না কেউ বাইরে থেকে এসে মিটিয়ে দেবে'।[১৭] 'যদি বলি, একজন ব্রিটিশ যুবকের নিঃশব্দ আত্মদান ছাড়া স্বামী বিবেকানন্দকে আজ আমরা যেভাবে পেয়েছি, সেভাবে পেতাম না'...'[১৮] গদ্যের এই প্রথম লাইনে সন্মাত্রানন্দ যে ব্যক্তিত্বের কথা প্রসঙ্গ সূত্রে এনেছেন তা যে গুডউইন সাহেব, সেকথা গদ্যের শিরোনাম 'গুডউইন সাহেবের জীবন ও ব্রত'- এ স্পষ্ট হয়ে গেছে। তবে এর পশ্চাৎ-কাহিনি জানতে হলে উক্ত গদ্যটির কাছে যেতে হবে। "'Angels Unawares'-র ভাবালোকে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনদর্শন" গদ্যটি 'উদ্বোধন'-এর স্বামী বিবেকানন্দের সার্ধশতবর্ষ পূর্তি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল এবং পুনরায় সেটি 'আরক্তসুন্দর মুখশ্রী'-র অন্তর্ভুক্ত করা হলেও তা সাম্প্রতিক গদ্যসংকলনেও স্থান পেয়েছে। স্বামীজি 'Angels Unawares' কবিতাটি ১৮৯৮-এর পয়লা সেপ্টেম্বর লিখেছিলেন, পরবর্তী সময়ে প্রণবরঞ্জন ঘোষ কবিতাটির বঙ্গানুবাদ করেন। গদ্য মধ্যস্থ 'কবিতার কাঠামো ও বর্তমান প্রবন্ধের রূপরেখা' অংশটিতে গদ্যকার লিখছেন-' এই সুবিপুল জনসমুদ্রের তিনটি ঢেউ- তিনটি ব্যক্তিত্ব-উঠে এসেছে স্বামীজির এ কবিতার তিনটি স্তবকে।...এই তিনজন মানুষ তিনটি বৃহৎ জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি। এদের প্রত্যেকেরই ছিল জীবন সম্পর্কে বদ্ধমূল স্থবির ধারণা।...শুধু বাঁচতে গিয়ে,প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা থেকেই এরা তিনজন পেয়েছে তাদের তিন রকমের জীবনবোধ।...কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে উঠে এলেও তাদের সে অভিজ্ঞতা ছিল স্বাভাবিকভাবেই একপেশে। ফলত,এই একপেশে অভিজ্ঞতা জন্ম দিয়েছিল যে তিনরকম জীবনদর্শনের- তা-ও ছিল খণ্ডিত।... কিন্তু প্রকৃতি কৃপাময়ী। প্রকৃতি কোনো

সীমাবদ্ধতা মেনে নেন না। তাই, এদের তিন জনের জীবনেই এল একেকটা আকস্মিক অভিঘাত- একেক প্রকারের ঝাঁকুনি'।[১৯] কী সেই অভিঘাত যা তাদের তিনজনকে খণ্ডিত অভিজ্ঞতা থেকে পূর্ণ অভিজ্ঞতার দিকে চালিত করেছিল তার বিশ্লেষণধর্মী ব্যাখা পাওয়া যায় আলোচ্য গদ্যটিতে। গ্রন্থ আলোচনার একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে 'বিবেকবাণীর ভাষ্যকার স্বামী রঙ্গনাথানন্দ' গদ্যটি আমরা পেয়েছি, সেটির উল্লেখ আমরা আলোচনার একেবারে শুরুর দিকেও পেলেও সে প্রসঙ্গ ছিল ভিন্ন। রঙ্গনাথানন্দ, যিনি শৈশবে শঙ্করণ নামে পরিচিত হলেও পরবর্তীকালে তাঁর মহৎ জীবন আমাদের ভাবনাকে প্রভাবিত করে। তাঁর সম্পর্কে সন্মাত্রানন্দ গদ্যের শেষে বলেছেন, 'তিনি এই নিষ্করুণ নির্দয় বিশ্বের নদীচরে তাঁর সমস্ত ইতিবাচকতা, গভীরতা, সমদর্শিতা, ভালোবাসা নিয়ে একা একা বন্ধুহীন হেঁটে চলে গেছেন। বালুচরে তাঁর পায়ের ছাপ পড়ে আছে। নদীজল তা বারবার মুছে দিতে চাইছে। কিন্তু পারবে না।[২০] একক শরীরের একাধিক কার্যক্ষমতা, ইন্দ্রিয় সহযোগে যেভাবে সঞ্চালিত হয় তেমন করে একক গদ্যসংকলনের দ্বারা সাহিত্যিক সন্মাত্রানন্দ একাধিক চিন্তণ-মনন-বিশ্লেষণের ধারাকে আমাদের মজ্জাগত করার চেষ্টা করেছেন। অনুকূল-প্রতিকূলতার ভেদাভেদ ঘুচে গিয়ে সেখানে সকল আলোচনা সহাবস্থান করেছে। সেই আলোচনা কখনও মননধর্মী, কখনও চিন্তাপ্রসূত, কখন ভাবনাগত, আবার কখনও বিশ্লেষণধর্মী যা গদ্যসাহিত্যের বিশুদ্ধরূপের বাহক বলে মনে হয়েছে। এই গদ্যভাষা যুগপোযোগী হলেও তাতে ধর্মীয় আখ্যান বর্তমানের প্রেক্ষাপটে যেমন সহজ-সুষমা ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে তেমনই ভবিষ্যতের আশঙ্কাকেও গদ্যকার বাস্তবিক কার্য-কারণ সূত্রে গেঁথেছেন।

তথ্যসূচী:

মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার (ডিসেম্বর ১৯৬৭). ‘*বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস*(দ্বিতীয় সংস্করণ). কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং. পৃষ্ঠা- ১২,১৩

সন্মাত্রানন্দ (জুন২০২৩). ‘*শ্রীগদ্যশরীর*’. কলকাতা: ধানসিড়ি. পৃষ্ঠা-৭ (ভূমিকা)

তদেব, পৃষ্ঠা- ১৫২

তদেব, পৃষ্ঠা- ২০৭

তদেব, পৃষ্ঠা- ১৭, ১৮, ১৯, ২০

তদেব, পৃষ্ঠা- ১৬

তদেব, পৃষ্ঠা- ৪১

তদেব, পৃষ্ঠা- ৬০

তদেব, পৃষ্ঠা- ৬৬, ৬৭

তদেব, পৃষ্ঠা- ৭৬

তদেব, পৃষ্ঠা- ৯৭

তদেব, পৃষ্ঠা- ৯৬

তদেব, পৃষ্ঠা- ১১৩, ১১৪

তদেব, পৃষ্ঠা- ১২৩

তদেব, পৃষ্ঠা- ১৩৩

তদেব, পৃষ্ঠা- ১৫৩

তদেব, পৃষ্ঠা- ১৬৬

তদেব, পৃষ্ঠা- ১৬৭

তদেব, পৃষ্ঠা- ১৮৩, ১৮৪

তদেব, পৃষ্ঠা- ২০৮